মননসুধা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

সদ্যঃপ্রয়াত প্রাক্তন অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা—ভগিনী নিবেদিতা নিজের নাম সই করতেন এই লিখে। স্বামী বিবেকানন্দের কন্যা, শিষ্যা তিনি। জীবন সমর্পণ করেছিলেন গুরুর আদিষ্ট কাজে—ভারতসেবায়। সুতরাং 'বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—এই পরিচয়েই তিনি এদেশে সুপরিচিতা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে গুরুর গুরু পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্যটি আলোচনাসাপেক্ষ।

ইউরোপীয় সভ্যতা-শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট মার্গারেট নোবলের ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় নবজীবন লাভ হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য শক্তি ও অনুপ্রেরণায়। তাই স্বামীজীর কাছে তাঁর আনুগত্য ও শরণাগতি ছিল স্বাভাবিক। তবে স্বামীজীর যেমন, তেমনই নিবেদিতারও এক গভীর প্রজ্ঞা ছিল, যা শুধুমাত্র বুদ্ধি বা মেধা নয়, যার উৎস মনবুদ্ধি ছাড়িয়ে আত্মায় বা আত্মচৈতন্যে। বুদ্ধদেব তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের—তিনি রাজপুত্র হয়ে কেন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে তিনি এখন আর তাঁর পুত্র নন, 'he belongs to the line of prophets'। এ-উত্তরটি স্বামীজীর অতীব প্রিয় ছিল এবং তিনি গুরুভাইদেরও একথা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গৌরবের সঙ্গে বলতেন যে তাঁরাও 'belong to the line of prophets.' নিবেদিতা ওই 'line of prophets' -এর ধারাটি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতের অধ্যাত্মজীবনে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

ভগিনী নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করেননি। তিনি স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে দুর্লভ শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশ পেয়েছেন। শ্রীমা সারদা দেবীর দিব্য সান্নিধ্যলাভেও ধন্য হয়েছেন তিনি; শুধু তাই নয়, তাঁর অপার্থিব স্নেহ-ভালবাসায় স্নাত হয়ে তাঁর প্রিয়কন্যা 'খুকি'

হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা তাঁর গুরুর মুখে শুনেছেন বারংবার, তাঁকে দেখেছেন 'মানসনেত্রে' এবং বুঝেছেন বিবেকানন্দরূপ এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি উজ্জ্বলতর কোনও জ্যোতিষ্ক থেকেই উৎসারিত হয়েছে। উপলব্ধি করেছেন, এই অধ্যাত্মসূর্যটি উদার, বিশাল গগনের প্রেক্ষাপট ছাড়া উদিত হতে পারে না এবং সেই গগন শ্রীরামকৃষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, ''হায় তপন, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।''

নিবেদিতা স্বামীজীর আহ্বানে তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলেন এবং অমরনাথ-দর্শন করার পর তাঁর গুরুর মুখাবয়বে যে-দিব্যভাব ফুটে উঠেছিল তা প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পেরেছিলেন 'অমরনাথজী' তাঁকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। তিনি জানতেন স্বামীজী ইচ্ছা করলেই শিষ্যাকে সেই দুর্লভ দর্শন ঘটিয়ে দিতে পারেন, এবং সেটি আশাও করেছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতার মনোভাব বুঝে তাঁকে জানিয়েছিলেন, নিবেদিতা যা আকাঙ্ক্ষা করছেন, তাঁকে সে-উপলব্ধি করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই, কারণ তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস নন। এইসব কথা থেকেই নিবেদিতার মননে রামকৃষ্ণ-মহিমা সম্বন্ধে প্রত্যয়টি গঠিত হয় ও পুষ্টিলাভ করে।

নিবেদিতাকে আমরা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, মেধাবী রূপেই পেয়েছি। নাহলে তিনি স্বামীজীর সব abstract দার্শনিক তত্ত্ব ও তার ব্যাখ্যাদি বুঝতে সক্ষম হতেন না বা সেগুলির ওপর যথাযথ মন্তব্য করতেও পারতেন না, যার পরিচয় আমরা তাঁর 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পেয়েছি। তবে ভারতে অধ্যাত্মজীবনে সাধারণত গুরুদেবের প্রতি যে-পূজা বা ভক্তিভাব বোঝায়, বা 'প্রশ্নাতীত আনুগত্য' সহ পূজার আসনে তাঁকে বসাই আমরা, স্বামীজীর প্রতি নিবেদিতার এমন ভাব ছিল বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম চরিত্র, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, উদারতা যা তৎকালীন চার্চ অনুমোদিত খ্রিস্টধর্মে নিবেদিতা দেখেননি এবং অবশ্যই তাঁর তীব্র, ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম—এসবের কাছেই তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। স্বামীজীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় তাঁকে অবশ্যই মুগ্ধ করেছিল। শুধুমাত্র মননশীলতা ও অনুভূতিপ্রবণ, পরিশীলিত মন নিয়েই তিনি স্বামীজীকে ধারণা করতে পেরেছিলেন, সেকথা বেশ পরিষ্কারভাবেই তাঁর গ্রন্থে পরিস্ফুট রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীজীকে কোনও দিব্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে অনুগত করতে হয়নি যেমনটি তাঁর ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেবকে করতে হয়েছিল দিব্যস্পর্শের মাধ্যমে। নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতন মার্গারেট নোবলও সত্যসন্ধানে প্রশ্নমুখী ছিলেন এবং সহজে কিছু মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মন প্রথম অবস্থায় যেমন একান্তভাবেই ঈশ্বরকেন্দ্রিক ছিল এবং তাঁকে জানতে পারাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, মার্গারেট নোবলের তা ছিল না। তাই দুটি ক্ষেত্রে দুই গুরুর ব্যবহারও ভিন্ন হয়েছিল।

নিবেদিতা স্বামীজীর পূর্বজীবনের এইসকল কাহিনিই শুনেছিলেন এবং বুঝেছিলেন, তাঁর মতন এমন কঠিন, ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে যিনি নমনীয়, প্রচলিত সাকার ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন একপেশে নির্গুণ নিরাকার ধর্মবিশ্বাসকে সরিয়ে দিয়ে, সেই রামকৃষ্ণদেবের ঐশ্বরিক শক্তি কী অসাধারণ! স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার যে approach, তা ঠিক এমনটি ছিল না। তিনি স্বামীজীর অতুলনীয় হৃদয়বত্তা, বিশ্বজনীন বৈদান্তিক ধর্মচেতনা, দুর্লভ সমন্বয়চিন্তা, সর্বোপরি সন্ন্যাসীর স্বদেশপ্রেম—যা

সচরাচর মোক্ষকামী সাধুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না—এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রধানত। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলির একত্র অবস্থান, তাঁর পূর্বজীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের পার্থক্য অনুসন্ধানে নিবেদিতা আবিষ্কার করেছিলেন বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই।

সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেব না থাকলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ হতে পারতেন না; তাঁর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাতেই বিবেকানন্দ আলোকিত হয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেও বিনয়নম্র চিত্তে স্বীকার করে গেছেন যে, তাঁর যেসব কথা মানবের কল্যাণসাধন করেছে, তা সবই তাঁর গুরুর কথা। আর একইসঙ্গে জানিয়েছেন, যদি তাঁর কোনও বাক্যে কারও অকল্যাণ হয়ে থাকে, তবে তা তাঁর নিজের সৃষ্ট। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, নিবেদিতা যেমন করেছিলেন, উপযুক্ত জমি বা আধার না হলে তাতে বীজরোপণ ফলবান হয় না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবার কল্যাণমূলক আদর্শ কর্মযোগকে জগতে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ও তাঁর গুরুকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। নিবেদিতা তাঁর অনন্যসাধারণ মননশীলতা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে রামকৃষ্ণদেবের মহৎ জীবনের প্রেক্ষাপটেই স্বামী বিবেকানন্দকে ধারণা করা যাবে, নাহলে তাঁকে বোঝা সম্পূর্ণ হবে না।

ঊনবিংশ শতকে ভারতে হিন্দুধর্মের প্রবল গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সময়ে, রামকৃষ্ণদেবের ধর্মীয় উদারতা, সহনশীলতা, সমন্বয়কারী মৌলিক চিন্তাধারা এবং নিজ জীবনে ও কর্মে তার প্রয়োগ ও সেইসঙ্গে নিজ শিষ্যদের সেই উদারপথে পরিচালনা করা—নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর বুদ্ধি ও সত্তাকে চমৎকৃত করেছিল। নিজভূমিতে তিনি দেখে এসেছিলেন চার্চকেন্দ্রিক খ্রিস্টধর্মের মধ্যে কত বাঁধাবাঁধি নিয়ম, অনুষ্ঠান-নির্ভরতা, অখ্রিস্টীয় মনোভাবের প্রতি তাচ্ছিল্য। এসব তাঁকে চার্চের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। তখন থেকেই তিনি ধর্মের প্রকৃত রূপটি, প্রকৃত অর্থটি জানতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজীর বেদান্ত ধর্মাদর্শে, অদ্বৈত ধর্মানুশাসনে সেই উদার আকাশের ব্যাপ্তি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাকে হৃদয় দিয়ে, মেধা দিয়ে গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন যে হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে পাশ্চাত্যে উপস্থিত হলেও স্বামীজীর মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এই পরিচয় পেয়েই তাঁর বোধ হয়েছিল যে হিন্দুধর্ম শুধু কতগুলি taboos নয়, totemism, animism-এর মতো জড়বাদী ধর্মচেতনা নয়, এর মধ্যে আদর্শগত ও সমাজগঠনমূলক মৌলিক উপাদানও যথেষ্ট আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, সব ধর্মই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, ঈশ্বরকে ভক্তিবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার করে ভাবতে হবে এবং তিনি সর্বভূতে বিরাজমান—এই চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে জগতের সকলের প্রতি প্রীতি ও সেবাভাব অবলম্বন করে জীবনধারণই যথার্থ ধর্মজীবন। এতেই মানবজীবনের পূর্ণতা, আনন্দ ও শান্তিলাভ—এরূপ ধর্মজীবনাদর্শই রামকৃষ্ণদেবের উদ্দিষ্ট ছিল—একথা নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে বারবার শুনেছিলেন; স্বামীজীর মধ্যে সেই উচ্চতম ভাবের অভিব্যক্তি দেখে তাঁর গুরুদেবের মহিমা অবহিত হয়েছিলেন ও তাঁর অনুগত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নিবেদিতা নিজে শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর ভাষণ শোনেননি, কিন্তু তিনি জেনেছিলেন যে স্বামীজী যখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন, তা ছিল প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাই, কিন্তু যখন তিনি ভাষণ শেষ করলেন তখন 'Hinduism was created'। এই নব আলোকপাত বিবেকানন্দ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রজ্ঞার আলোক সহায়েই।

যে-উচ্চতম ধর্মজীবনের শিক্ষা তিনি গুরুর কাছে পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা স্বামীজীর মধ্যে জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গটি দেখে তার পিছনে যে-বিশাল রামকৃষ্ণরূপ জ্ঞানাগ্নির আধারটি রয়েছে, তাকে অবলোকন করতে সমর্থ ছিলেন এবং 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—এই উভয়ের শ্রীপদে আত্মনিবেদন করে সার্থক হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৯৯ সালের ২৮ মে ভগিনী কালীঘাটে যে-বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মা কালীর অবতাররূপেই তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে মনে করেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাঁকে ওইভাবেই গ্রহণ করবে। স্বামীজীও এই মনোভাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ওই বছরই ১৮ ফেব্রুয়ারি The Statesman পত্রিকায় তিনি লেখেন, ''দক্ষিণেশ্বরের এক অখ্যাত কালীপূজক হয়ে রামকৃষ্ণদেব যে এক সর্বজনীন উদার ধর্মীয় সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করে গেছেন, দীর্ঘদিন পরে তা আধুনিক কালের শিক্ষিত ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তিদের কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু বলেই প্রতিভাত হবে।" এদের মধ্যে তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বমানবতা ধর্ম নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক চিন্তা ও তার অনুশীলনের বার্তা, দ্বৈতবাদী কালীসাধক হয়েও তাকে অতিক্রম করে অদ্বৈততত্ত্বে তাঁর উত্তরণ—ব্যাবহারিক জীবনে, বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁকে এক অনন্য স্থান দিয়েছে।

নিবেদিতার স্কুলের একটি ঘরে একদিকের দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি ছিল, আর একদিকের দেওয়ালে ঝুলত পৃথিবীর মানচিত্র। নিবেদিতা একদিন মানচিত্রখানি খুলে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির নিচে টাঙিয়ে দিয়ে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু, পৃথিবী তাঁর পদতলে থাকবে।

'Kali The Mother' গ্রন্থে 'রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেবের কালী উপাসনা বিশ্বমাতৃত্বের উপাসনা এবং তার মধ্য দিয়েই তিনি বিশ্বমানবতা ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৮৯৯ সালের ২৬ এপ্রিল নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন, তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসে রামকৃষ্ণদেবের চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন : ''My own are ever mine"—''যারা আমার তারা চিরদিন আমারই।" এসব কথা থেকে নিবেদিতা মনের গভীরে এই আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, তিনি শুধু তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দেরই আশীর্বাদধন্য নন, তিনি পরমগুরু, জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও কৃপার পরিমণ্ডলে রয়েছেন।

একদিন ধ্যানের সময় তিনি ভাবমগ্ন হয়ে দেখেন, স্বামীজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তিতে বিলীন হয়ে গেল। স্বামীজীর মহাসমাধির পূর্বরাত্রেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই যেন দ্বিতীয়বার শরীরত্যাগ হচ্ছে। এসব ঘটনা তাঁর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, স্বামীজীর মধ্যে ওতপ্রোত শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্তা, তাঁকে বাদ দিয়ে স্বামীজীকে ভাবা যাবে না। স্বামী প্রেমেশানন্দ তাঁর রচিত সংগীতে স্বামীজীর পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—''কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণময়।" নিবেদিতা এই মিলিত সত্তার কাছেই তাঁর পূর্ণ শরণাগতি জানিয়ে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। ভারতাত্মা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ থেকে নিবেদিতা একই আদর্শের ধারাবাহিকতা—একেই তো 'line of prophets' বলতে হবে। ✠